মৃত্যু নেই নভেম্বর বিপ্লবের, মৃত্যু নেই সমাজতন্ত্রের

মৃদুল দে

চারদিকে আমরা সবাই দেখছি মনুষ্যত্বহীনতার বিভীষিকা– কি অগ্রসর পাশ্চাত্যে কিংবা অনগ্রসর প্রাচ্যে। মানব সভ্যতার ৫ হাজার বছর ধরেই মুষ্টিমেয়র দ্বারা বিরাট জনসমষ্টির ওপরে চলছে নৃশংস শোষণ- অবিচারের ধারা। গত সাড়ে তিনশো বছরে নতুন এক ব্যবস্থায় এই ধারা আরও হিংস্র ও পোক্ত হয়েছে, যে ব্যবস্থার নাম পুঁজিবাদ এবং যা এখনো প্রায় গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে রেখেছে। এই ব্যবস্থা যতো উন্নততর হয়েছে, পাশাপাশি উন্নততর হয়েছে এই নৃশংস শোষণ ব্যবস্থাও। এই ব্যবস্থার অবসান ছাড়া বিশ্বের মানুষের নিস্তার নেই ক্ষুধা-দারিদ্র্য-বেকারি, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতনের হাত থেকে। মার্কস এবং মার্কসবাদের জন্মের আগে মনীষী ও চিন্তাবিদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু কি পরিবর্তন হবে, কিভাবে পরিবর্তন হবে, কারা করবে, বিকল্প কি এবং লক্ষ্যই বা কি— এর কোন যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক উত্তর মেলেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক পুঁজিবাদ যখন মধ্যগগনে ,যখন তার মধ্য দিয়ে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাব হয়, তখন এই মার্কস এবং তাঁর সহযোদ্ধা এঙ্গেলস পৃথিবীর সব দেশের ও সব জাতির আপামর মানুষের কাছে এই অমীমাংসিত প্রশ্নের অকাট্য-অখণ্ডনীয় বৈজ্ঞানিক উত্তর ও সমাধান তুলে ধরেছেন যাকে বলা হয় মার্কসবাদ, দেশে দেশে, যুগে যুগে পরিস্থিতির পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য অনুযায়ী যে বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রয়োগ ও সৃজনশীল বিকাশের মধ্যেই তার সার্থকতা নিহিত। পুঁজিবাদ সমূলে উৎখাত করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে এ দায়িত্ব ভবিষ্যৎ বিপ্লবীদের, ভবিষ্যৎ কমিউনিস্টদের। এটাই পুঁজিবাদীদের একচ্ছত্র একনায়কত্বে চলা পুঁজিবাদি ব্যবস্থার এক ও একমাত্র বিকল্প যা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ নামে গত দেড়শো বছরে গোটা পৃথিবীতে খ্যাত ও ক্রমব্যাপ্ত।

জন্মলগ্ন থেকেই এই মতবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে আটকানো ও ধ্বংস করার জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদের বর্বর অভিযান বৃদ্ধি পেতে থাকে, আজও তার বিরাম নেই। এজন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে আধুনিক থেকে আধুনিকতর সমস্ত ধরনের অস্ত্রের প্রয়োগ– সমস্ত ক্ষেত্রে যেমন মতাদর্শ, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে পুঁজিবাদের অনুগামী দল সংগঠন ও শক্তিগুলি একজোট হয়ে এই আক্রমণ চালায়। এতে বিপ্লবী আন্দোলন কোথাও পিছু হঠেছে, কোথাও স্তিমিত হয়েছে, কোথাও বিপর্যস্ত হয়েছে, কিন্তু স্তব্ধ হয়ে যায়নি। এই বিপ্লবী আন্দোলনের ধারায় মার্কসবাদের মতাদর্শের পতাকার নিচে রাশিয়ায় সমস্ত ধরনের বিপ্লবী সংগঠনগুলি জোট বাঁধে ঊনবিংশ শতাব্দীর একদম অন্তিমলগ্নে। নেতৃত্ব দেন লেনিন ও অন্যান্য বিপ্লবীরা। মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁরা গড়ে তোলেন বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার জন্য শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষকসহ অন্যান্য সহযোগী শ্রমজীবী জনগণের মজবুত সংগঠন। ঠিক এই সময় পর্বে পুঁজিবাদ তার বিকাশের শেষবিন্দুতে পৌঁছে যায় এবং উদ্ভব ঘটে অন্তিমস্তর সাম্রাজ্যবাদের। নতুন যুগের শুরু, পুঁজিবাদের পুরানো যুগ চিরকালের জন্য অস্তমিত। এই নতুন যুগে রাশিয়ায় জার শাসনের প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সঠিক কর্মকৌশল স্থির করে রুশ বিপ্লবীরা এগিয়ে যান। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯০৫ সালে ঘটে প্রথম বিপ্লব যাতে কেঁপে ওঠে পুঁজিবাদের ভিত্তিভূমি, শ্রমিকশ্রেণি কৃষক ও অন্যান্য অংশ তখনও বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্য অতটা প্রস্তুত ছিলো না এই বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তার প্রভাব পরে সুদুরপ্রসারী। এমনকি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোসকামী মনোভাবের ওপরেও আঘাত হানে এই বিপ্লব এবং তখন থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে জঙ্গি ও বিপ্লববাদী ধারার সূচনা। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম মহাবিদ্রোহের পর এই সময়েই ঘটে প্রথম শহিদদের মৃত্যুবরণ যা ক্রমে তীব্রতা লাভ করে।

চরম প্রতিক্রিয়াশীল-শাসিত রাশিয়ার এই সময়ের বিপ্লবী আন্দোলনে বহুমুখী ঝোঁক বিরাজ করছিলো। সংগঠন, মতাদর্শ ও কর্মকৌশলে মার্কসবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তীব্র বিতর্কের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী বিজ্ঞান আরও ধারালো হয়ে ওঠে। গোটা দুনিয়াকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার প্রাণসংহারী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯১৪ সাল থেকে যখন নিজেরা হীনবল হয়ে পড়ে, বিশ্ব পুঁজিবাদী শৃঙ্খলের দুর্বলতম স্থান রাশিয়ায় লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী শক্তি আঘাত করে এবং ১৯১৭ সালে আট মাসের ব্যবধানে উপর্যুপরি দুটি বিপ্লব ঘটে এবং প্রথমটিতে জার রাজত্বের উৎখাতের পর অক্টোবর মাসে (রাশিয়ার তৎকালীন বর্ষপঞ্জি অনুসারে) সফল হয় পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এর পিছনে আছে বহু শহিদ ও নির্যাতিতের রক্তক্ষয়ের অপরিসীম অবদান। যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ায় সব ভেঙে পড়েছে, দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধ থামেনি, তার মধ্যেই সফল বিপ্লব;পরাস্ত শক্তি প্রত্যাঘাত প্রতিবিপ্লবের জন্য মরিয়া। কয়েক মাসের মধ্যে যুদ্ধস্নাত সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশ্বের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৃত্যু পরোয়ানার পূর্বাভাস আঁচ করে। এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীদের যোগসাজশে এই বিপ্লবকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। দেশের শস্য ভাণ্ডারের দখল নেয় শত্রুরা, দুর্ভিক্ষ দিয়ে সোভিয়েত ক্ষমতাকে টুঁটি চেপে মেরে ফেলতে গ্রামীণ ধনী বা কুলাকরা সরকারকে তাদের ধরে রাখা শস্য বেশি দামেও বেচতে অস্বীকার করে। পশ্চিমি শক্তি অবরোধ করে বহির্জগত থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পৃথিবীর সব প্রচার মাধ্যমে তীব্র আওয়াজ তোলা হয়, সোভিয়েত ক্ষমতার আয়ু শেষ, অবস্থা তখন দেখাচ্ছিলও অনেকটা তাই। এমনকি সোভিয়েত বন্ধুদেরও ধারণা হয় যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দেশগুলির এত আক্রমণের সামনে পশ্চাদ্‌পদ, রক্তাক্ত, ভেঙেপড়া, অবরুদ্ধ একটা দেশ সামান্য অস্ত্র ও তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে দাঁড়াতেই পারবে না। বহু বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষক দেশ ছেড়ে চলে যায়। দোদুল্যমানতা প্রকট হয় মধ্যবিত্তদের মধ্যে।

অন্যদিকে, এতো দুঃসহ কষ্ট বা আক্রমণের মধ্যেও শ্রমিক-কৃষক ছিলো মরণপণ শেষযুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। লেনিন ডাক দেন বিপ্লবকে রক্ষা করা না গেলে সেই বিপ্লবের কোনো মূল্যই নেই। কেবলমাত্র সোভিয়েত ক্ষমতা কিংবা সোভিয়েত জনগণকে রক্ষা করা নয়, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের স্বার্থেই আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিসাবে গৃহযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণিও সোভিয়েত ক্ষমতা রক্ষার প্রতি সক্রিয় সংহতি জানান। ৩ বছর ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে, গোটা দেশ পরিণত হয় সামরিক তাঁবুতে। তিন বছরের এই গৃহযুদ্ধের শুরুতে সোভিয়েতের পক্ষে সৈন্য ছিলো ৩ লক্ষ। কয়েক মাসের মধ্যে তা দাঁড়ায় ১০ লক্ষে এবং ১৯২০ সালের শেষে

প্রায় ৫০ লক্ষে। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কেউ পালায়নি, বরং তিন বছরে পার্টি সদস্য দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৬ লক্ষ যার মধ্যে ৩ লক্ষ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে যুদ্ধে লড়াই করে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় ৫০ হাজারেরও বেশি কমিউনিস্ট। বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এমন নজির ইতিহাসে আর কোথায়! পাহাড় - জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে শ্রমিক -কৃষকরাও শত্রুর মোকাবিলা করতে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। সত্যিকারের অর্থে এই বিপ্লব ছিল সমগ্র জনগণের বিপ্লব। এমনকি বিদেশি শক্তির সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে যাদের অনেকেই সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী যুদ্ধ চালাতে অস্বীকার করে, লাল ফৌজকে সহায়তাও করে।

১৯২০ সালের নভেম্বরে গৃহযুদ্ধে জয়ী হয় লালফৌজ ও সোভিয়েত জনগণ। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হয় বিরাট। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবী শ্বেতফৌজ ও হানাদারদের সন্ত্রাসে, ক্ষুধা ও রোগে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। লালফৌজ হারায় প্রায় ১০ লক্ষ সদস্যকে। এই গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রতিবিপ্লবী দলগুলি ধসে পড়ে। যে দলগুলি নিজেদের 'বিপ্লবী', 'গণতান্ত্রিক', 'জাতীয়তাবাদী' এমনকি 'সমাজতান্ত্রিক' বলে দাবি করে তাদের নিষিদ্ধ করা হয়নি, তারা তাদের পত্র - পত্রিকাও প্রকাশ করতো। তাদের অনুগামীও মোটামুটি কম ছিল না। কিন্তু গৃহযুদ্ধে প্রতিবিপ্লবে তাদের ভূমিকার জন্য রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে বিলুপ্তির পথে যায়। এরাই লেনিনের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল; গুলিবিদ্ধ হয়েও তিনি প্রাণে বাঁচেন বটে, কিন্তু তাতে ১৯২৪ সালে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান। এসব নাশকতা চক্রান্ত তাদের পতন ডেকে আনে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এভাবে ঐতিহাসিক কারণেই কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য সব দলের অবসান ঘটে। দেশ, জনগণ, বিপ্লব, মুক্তি, দেশপ্রেম এবং পুঁজিবাদের বিকল্প শোষণহীন সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়াও পৃথিবীর বুকে সমাজতন্ত্রের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রক্ষা করতে এরকম সর্বস্বত্যাগের নজির মানব সভ্যতার ইতিহাসে বলতে গেলে নেই।

কিন্তু এরকম এক অবর্ণনীয় কঠিন অবস্থার মধ্যেও সোভিয়েত রাষ্ট্র শ্রমজীবী জনগণের জীবনমানের উন্নতির জন্য এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা পুঁজিবাদের ইতিহাসে ভাবাই যায়নি। গৃহযুদ্ধে পরাজয়ের পরেও প্রতিবিপ্লবীদের অবশিষ্টাংশ তাদের নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে, এরকম অভাবনীয় বিপর্যয়কর অবস্থার মোকাবিলার জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতির সুরক্ষার জন্য সোভিয়েত সরকারকে নতুন আর্থিক নীতি অনুসরণ করতে হয়— যা খানিকটা পুঁজিবাদকে সুযোগ দিয়ে সাময়িকভাবে পিছু হঠা এবং ভবিষ্যতের সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুরক্ষিত করতে। যেভাবে বিপ্লব হয়েছে, প্রতিবিপ্লব ভাঙা ও সমাজবাদে যাবার কৌশল অবলম্বিত হয়েছে তাতে লেনিনের কথায়, "বলশেভিকবাদ সকলের ক্ষেত্রে কৌশলের মডেল হতে পারে।" আন্তর্জাতিকতাবাদেরও মডেল এই মহান বিপ্লব। বহু দেশের শ্রমিক, মানুষ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠন এই বিপদের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে এসে দাঁড়ায়। আনাতোল ফ্রাঁ-র মতো নোবেল বিজয়ী লেখক তাঁর নোবেল পুরস্কারের সমগ্র অর্থ সোভিয়েত সরকারের ত্রাণ তহবিলে দান করেন। এরকম দৃষ্টান্ত অসংখ্য। গৃহযুদ্ধে এরকম কঠিন অবস্থার মধ্যে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে; বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলন ও স্বাধীনতার আন্দোলনকে সহায়তা করে বলশেভিক পার্টি।

এই সময়ে ভারত,চিন ও বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরিতে সোভিয়েত পার্টি প্রভূত সহায়তা করে। এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় বিভিন্ন দেশে পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে পার্থক্য। নভেম্বর বিপ্লবের কম্পন ঘুম ভাঙায় অনেক পিছিয়ে পড়া দেশের মানুষের। পরপরই ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম প্রাণ সঞ্চার হয় গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে; যদিও ভারতীয় জনগণ এই সংগ্রামে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে গেলেও গান্ধিজি পিছু হঠেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের শত্রুতা -অবরোধ কখনো হ্রাস পায়নি। তার মধ্যেই সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণে অসাধারণ সাফল্য অর্জিত হয় যা কোনো পুঁজিবাদী দেশে কল্পনাই করা যায় না। গৃহযুদ্ধের পর মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশ নিরক্ষর সংকটগ্রস্ত দৈন্যদশা -আক্রান্ত মানুষের সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্ত হয় নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, বেকারি, ক্ষুধা, অনাহার, পুঁজিবাদী হিংস্রতা, অন্যায়-অবিচার, নারী-পুরুষের বৈষম্য ইত্যাদি অভিশাপ থেকে। মানব সমাজের ইতিহাসে এটাও নজিরবিহীন। রবীন্দ্রনাথ যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে সভ্যতার এই বিকাশে মুগ্ধ হয়ে আপ্লুত তখন ভারতের বর্তমান মোদি শাসনের রাজনৈতিক পূর্বসূরী আর এস এস ইউরোপে ফ্যাসিস্ট রাজত্বের কর্ণধার মুসোলিনী এবং হিটলারের সঙ্গে ভারতে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কায়েমের লক্ষ্যপূরণের জন্য শলা- পরামর্শ গ্রহণে ব্যস্ত। সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসকদের তীব্র বিদ্বেষ প্রচারের মধ্যে জওহরলাল নেহরু সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিরাট সাফল্য এবং সমগ্র জনগণের বিস্ময়কর অগ্রগতি স্বচক্ষে দেখে ভারতে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অসাধারণ সাফল্য সম্পর্কে প্রচার করেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয় যার অনুপ্রেরণার উৎস সোভিয়েত জনগণের সুরক্ষিত মৌলিক অধিকার। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের এই বিপুল সাফল্য গোটা পৃথিবীকে ফ্যাসিস্ট গ্রাসের কবল থেকে মুক্ত করতে প্রধান সহায়কের ভূমিকা পালন করে। দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের জয় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের হিংস্রতম রূপ ফ্যাসিবাদের পরাজয়েই সম্ভব হয়। শুধু ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটাতেই নয়, দেশে দেশে স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনে উৎসাহদাতা ও বিশ্বস্ত সহায়কের ভূমিকা পালন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনা ১৯৪৯ সালের চিন বিপ্লব। বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলি প্রমাণ করে যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমাজবাদ ও কমিউনিস্টদের শত্রুতা করেছে তারা সচেতন বা অচেতনভাবে সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের অনুগামী।

সমাজতন্ত্র পরিচালনায় ও বিকাশে নেতৃত্বের গুরুতর বিচ্যুতিসহ নানা কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘটলেও সমাজতন্ত্রের এই অতুলনীয় সাফল্য কখনো ম্লান হতে পারে না। এ কারণেই ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অবস্থান ইতিহাসের সব বীরত্বপূর্ণ ঘটনার শতবর্ষ বা সহস্রাব্দ উদ্‌যাপনের বহু উর্ধ্বে। বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের আবিষ্কর্তা ইতিহাসের সেরা চিন্তাবিদ কার্ল মার্কসের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীও এই কারণে পালিত হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত প্রান্তে। মানবজাতির মহত্তম ঘটনাবলির মধ্যে সেরা স্থান লাভ করেছে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার, মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠা এবং মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার বাস্তব রূপায়ণ— যুগে যুগে যা অক্ষয় এবং অব্যয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতো কোন বৈজ্ঞানিক মতাদর্শেরই মৃত্যু নেই; সেকেলে যন্ত্রপাতির মতো কখনো এসব মতাদর্শ জঞ্জালে পরিণত হয় না, যেমনটা হয় অন্যসব মতাদর্শের ক্ষেত্রে।

যে দেশেই হোক। বাস্তব বিচারে আজন্ম পুঁজিবাদ মানুষের কাছে সাক্ষাৎ নরক। নরক প্রভুদের নয়া উদারীকরণের গত আড়াই দশক এই

নারকীয়তায় আরও বীভৎসা এনেছে। দু'দশক আগে কবি অরুণ মিত্র লিখেছেন: হ্যাঁ, মানুষ বিক্রি হচ্ছে খাওয়ার জন্যে। তবে আগের মতো শিক কাবাব বানিয়ে নয়। এখন আমরা বিজ্ঞানের যুগে আছি, সুতরাং কাজটা বৈজ্ঞানিকভাবেই করা হয়। পদ্ধতিটা এইরকম। মাথার ঘিলুই তো শরীরের সেরা অংশ, যদিও সবচেয়ে গোলমেলে। তবে সবচেয়ে উপাদেয়ও বটে। ওটা পরপর নানারকম শব্দের ধাক্কা লাগিয়ে গলিয়ে ফেলা হয়, যাতে ভাবনা- চিন্তার শখ আর না থাকে। কে কিরকম বা কোন্‌টা কেমন, এসব যাচাই করার ঝোঁকটা উবিয়ে দিয়ে মগজ ধোলাই করা প্রথমেই দরকার। তারপর অন্য শব্দের মশলা ভরা রোদ্দুরে, বৃষ্টিতে, ঠান্ডায়, গরমে এ পথে সে পথে ঘোরাও। ব্যস হয়ে গেলো অতি সুস্বাদু খাদ্য। মস্তিষ্ক চর্বণে আর কোনো অসুবিধে নেই। হাত-পা'র ব্যবস্থাও বৈজ্ঞানিক উপায়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে করা হয়ে থাকে। হাতগুলোকে কারখানার চাকায় জুড়ে ঘুরতে দাও। পা-গুলোকে লাঙলের সঙ্গে জুড়ে চাষের ক্ষেতে ঘোরাও। যেমন চাও তেমনি তৈরি হয়ে যাবে সব। বাকি থাকে পেট ও পিঠ। ও নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। কোনো কিছু গিলিও না। দেখবে শেষ পর্যন্ত পেট -পিঠ এক হয়ে মুচমুচে হয়ে গেছে। এইভাবে মানুষ খাওয়া হয় এখন। আগেকার মতো অসভ্য কায়দায় নয়।'

১৯৪৩-এ তাঁরই কবিতাংশ:

'প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার?
লাল অক্ষর আগুনের হলকায়
ঝলসাবে কাল জানো!'